৬০

দৈনিক বাংলা

তারিখ ...23 FEB 1995 ...
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৬

সবার জন্য শিক্ষাঃ প্রাথমিক শিক্ষা ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি

মোঃ নাজমুল হুদা খান

শিক্ষা মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকতর। শিক্ষার প্রধান কাজ হচ্ছে জ্ঞানের আলো দান করা। পরিমার্জিত করা এবং উৎপাদক্ষম সুস্থ সবল জনশক্তি গড়ে তোলা। শিক্ষা মানুষের অন্তর্নিহিত সৃষ্টিশীল মেধার বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। আর এ সৃষ্টিশীলতা মানুষকে কল্যাণমুখী করে গড়ে তোলে। শিক্ষার আলোর কাঠির ছোঁয়ায় মানুষ হয়ে উঠে সুন্দর। জীবনকে তার পারিপার্শ্বিক পরীক্ষাকে, মূল্যবোধকে, রাষ্ট্রধর্মের অন্তর্নিহিত দর্শনকে সে নিয়ত বিকশিত করে তুলতে সক্ষম হয়। তাই বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫ নং ধারায় অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও স্বাস্থ্যের সাথে শিক্ষার ওপর সমান গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সংবিধানের এ ধারায় বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং জনগণের জীবন যাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধন। জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত উন্নতি সাধন অর্থাৎ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সকলের জন্য শিক্ষা। জাতিকে উন্নতর কাংখিত সোপানে পৌছাতে হলে শিক্ষার বিকল্প নেই। যে জাতি যত বেশী শিক্ষিত সে জাতি তত বেশী উন্নত।

শিক্ষার মানদন্ডে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় এখনো অনেক পিছিয়ে রয়েছে। ১৯৯১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী আমাদের মোট জনসংখ্যার শিক্ষিতের হার মাত্র ৩৪.৬ শতাংশ। আমরা যে আজ শিক্ষায় এত পিছিয়ে তার ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি রয়েছে। সেগুলোর ব্যাখ্যা করার অবকাশ আজ এখানে নেই। দু'শ বছরের উপনিবেশক শাসন, পঁচিশ বছরের বৈষম্যমূলক পাকিস্তানী শাসন, ধর্মীয় ও সামাজিক গোড়ামী এসব বহু বিষয় আমাদের শিক্ষা প্রসারের পথে অন্তরায় হিসাবে কাজ করেছে।

১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হবার পর নতুন আশা ও উদ্দীপনা নিয়ে শুরু হল শিক্ষা ব্যবস্থাপকে নতুন ধাঁচে ও ঢেলে সাজাবার পরিকল্পনা। একটি গণমুখী, উৎপাদনমুখী ও জাতীয় সংস্কৃতি ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার প্রয়োজনে ১৯৭৩ সালে আইনের মাধ্যমে দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করা হল। ১৯৮১ সালে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী চালু হল। বর্তমানে দেশে প্রায় চুয়ান্ন হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। তন্মধ্যে বার হাজারেরও বেশী রয়েছে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা মূল্যে টেক্সট বই দেয়া হয়। আগামীতে কাগজ, পেন্সিলসহ অন্যান্য শিক্ষা সামগ্রীও বিনামূল্যে সরবরাহের বিষয় সরকারের বিবেচনায় রয়েছে। তাছাড়াও বর্তমানে দেশের প্রতিটি থানায় একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় এ প্রতিটি দুঃস্থ শিশুদের অভিভাবককে ১৫ কেজি করে গম দিচ্ছে। দুয়ের অধিক শিশুকে স্কুলে পাঠালে সর্বোচ্চ ৩০ কেজি পর্যন্ত গম দেয়া হয়। এ পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে সরকার ব্যয় করছে ৮০ কোটি টাকা। এটা করা হয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের যাতে স্কুলে ছেড়ে না যায় এবং দরিদ্র পিতামাতা যাতে করে তাদের সন্তানদেরকে স্কুলে পাঠাতে আগ্রহী হন তজ্জন্য। তাছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আরও বেশী স্বাস্থ্যসম্মত ও আকর্ষণীয় করার পরিকল্পনাও রয়েছে সরকারের।

বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত আমাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কথা বলাই বাহুল্য। এ জন্য মানব সম্পদ উন্নয়ন হচ্ছে সকল উন্নয়নের চাবিকাঠি। তাই শিক্ষাকে মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক উপকরণ হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে। তন্মমধ্যে হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষাকে শিক্ষার মূল ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ। দারিদ্র্য দূরীকরণ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, নতুন চিন্তা ও চেতনার সৃষ্টি এবং সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। এ গুরুত্ব অনুধাবন করেই বর্তমান সরকার প্রাথমিক, অনানুষ্ঠানিক ও গণশিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে।

তাই আজ সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ বর্তমান সরকারের একটি দৃঢ় রাজনৈতিক অংগীকার। বাংলাদেশ ১৯৯০ সালের মার্চ মাসে থাইল্যান্ডের জেমিটীন ওয়ার্ল্ড ডিকলারেশন অন এডুকেশন ফর অল এবং ১৯৯০ এর সেপ্টেম্বর মাসে নিউইয়র্কের কনভেনশন অন দি রাইটস অব চিলড্রেন-এ স্বাক্ষর করেছে। বর্তমান সরকারের গৃহীত কর্মসূচীতে এসব আন্তর্জাতিক ঘোষণার প্রতিফলন ঘটছে। প্রাথমিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করেই ১৯৯২ সালের আগস্ট মাসে প্রাথমিক শিক্ষা নামে একটি নতুন বিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এ বিভাগের কাজ প্রধান মন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে।

১৯৯০ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস করা হয়। এ আইনের আওতায় ৬ থেকে ১০ বছর বয়স্ক সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ১৯৯২ সালের জানুয়ারী মাস থেকে দেশের মোট ৬৮টি থানায় এ আইন কার্যকর করা হয়েছে। এবং সাফল্য লক্ষ্য করে ১৯৯৩ সালে ১লা জানুয়ারী থেকে দেশের বাকী অংশেও এ কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হয়েছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে।

১৯৯৩ সালে দেশের ৬ থেকে ১০ বছর বয়সসীমা শিশুদের স্কুলে ভর্তির হার হচ্ছে ৭৮ শতাংশ। ১৯৮৪ সাল নাগাদ এ হার ৮৫ শতাংশে এবং ২০০০ সাল নাগাদ ৯৫ শতাংশে নেয়ার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ১৯৯৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারী হার হচ্ছে মাত্র ৪০ শতাংশ। ১৯৮৫ সালে এ হার ৫২ শতাংশে এবং ২০০০ সালে ৭০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। তাছাড়া বয়স্ক শিক্ষার বর্তমান হার ৩৫.৩ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৯৮৫-তে ৪০ শতাংশ এবং ২০০০ সাল ৬২ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। সবার জন্য শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় কমিটি কাজ করে যাবেন। উনষাট সদস্যের এ কমিটিতে সংসদ সদস্য, সরকারী কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক এবং বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধিগণ রয়েছেন। জাতীয় কমিটির কাজকে সহায়তা দান করছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিবের সভাপতিত্বে স্টিয়ারিং কমিটি। তাছাড়া রয়েছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট দফতর এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সদস্য সমন্বয়ে একটি টাস্কফোর্স। এ টাস্কফোর্সের কাজ হচ্ছে সরকারের নীতি প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে যথাযথ সুপারিশ করা।

(১১-এর পৃঃ দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা

তারিখ ...23 FEB 1995 ...
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৬

(৯-এর পৃষ্ঠার পর)

সবার জন্য শিক্ষা

আমাদের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও প্রাথমিক শিক্ষার হিসাব ছিল মোট শিক্ষা খাতের বরাদ্দের মাত্র ২০ শতাংশ। বর্তমান সরকার প্রাথমিক শিক্ষা উপখাতে বরাদ্দ অনেক বাড়িয়েছে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শিক্ষাখাতের মোট বরাদ্দের ৬৫ শতাংশই হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা উপখাতের জন্য। এ বৃদ্ধি ১৯৮৫-৯০ এর পরিকল্পনার চেয়ে ২০০ শতাংশ বেশী। চলতি অর্থ বছরে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখা রয়েছে। এ বরাদ্দের পরিমাণ ২৭১৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা যা মোট জাতীয় বাজেটের ১৪.১৫ শতাংশ। এর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার বরাদ্দ হচ্ছে ৫০ শতাংশ।

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতিকে প্রধান কেন্দ্রবিন্দু করে সরকার একটি বহুমুখী সাধারণ শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের মূখ্য উদ্দেশ্যে হচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার বাড়ান, শিক্ষার মান বাড়ান এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মান বাড়ানো। ১৯৯০ সাল থেকে এ প্রকল্প কাজ করে যাচ্ছে এবং ১৯৯৫ সাল নাগাদ এর মেয়াদ শেষ হবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার বাড়ানো ও নিশ্চিতকরণের জন্যও সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে জনগণ পরিচালিত ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন এবতেদায়ী মাদ্রাসা এবং মক্তব এগুলোকেও প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য ব্যবহার করা হবে। ১৯৯৫ সাল নাগাদ বর্তমানে চালু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫০ হাজার নতুন শ্রেণীকক্ষ তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। ২০০০ সাল নাগাদ আরো ৫০ হাজার নতুন শ্রেণী কক্ষ তৈরি করা হবে। স্থানীয় মানচিত্রায়নের ও নিরক্ষণের মাধ্যমে নতুন প্রয়োজন নির্ণয় করা হবে। তাছাড়া জনগণের সহায়তায় দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট স্যাটেলাইট স্কুল স্থাপন করা হবে আরো পঁচিশ হাজার। সরকার বর্তমানে ৪০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়নের এক ব্যাপক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। খুশীর কথা যে এ চারশ কোটি টাকা বাংলাদেশ সরকার নিজস্ব সম্পদ থেকে খরচ করেছে।

এ ছাড়া রয়েছে উন্নতমানের কারুকুলাম ও টেক্সট বই রচনার কর্মসূচী, ফলপ্রসূ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, ক্রমাগত স্থানীয় ব্যবস্থাপনা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি কর্মসূচী এবং সহযোগিতাদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমন ন্যাশনাল এ্যাকাডেমী ফর প্রাইমারী এডুকেশন, ন্যাশনাল কারুকুলাম এ্যান্ড টেক্সট বুক বোর্ড, ন্যাশনাল এ্যাকাডেমী অব এডুকেশনাল ম্যানেজমেন্ট এবং বাংলাদেশ ব্যুরো অব এডুকেশন এ্যান্ড স্ট্যাটিসটিককে আরো বেশী সক্ষম ও শক্তিশালী করা হচ্ছে।

বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা মূল্যে টেক্সট বই দেয়া হয়। আগামীতে কাগজ, পেন্সিলসহ অন্যান্য শিক্ষা সামগ্রীও বিনামূল্যে সরবরাহের বিষয় সরকারের বিবেচনায় রয়েছে। তাছাড়াও বর্তমানে দেশের প্রতিটি থানায় একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় এ প্রতিটি দুঃস্থ শিশুদের অভিভাবককে ১৫ কেজি করে গম দিচ্ছে। দুয়ের অধিক শিশুকে স্কুলে পাঠালে সর্বোচ্চ ৩০ কেজি পর্যন্ত গম দেয়া হয়। এ পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে সরকার ব্যয় করছে ৮০ কোটি টাকা। এটা করা হয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের যাতে স্কুলে ছেড়ে না যায় এবং দরিদ্র পিতামাতা যাতে করে তাদের সন্তানদেরকে স্কুলে পাঠাতে আগ্রহী হন তজ্জন্য। তাছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আরও বেশী স্বাস্থ্যসম্মত ও আকর্ষণীয় করার পরিকল্পনাও রয়েছে সরকারের।

বাংলাদেশের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত করার এগুলো হচ্ছে সরকারী প্রয়াস। সরকার ও দেশের আপমর জনগণ আজ চায় অক্ষর জ্ঞানহীন মূঢ়তার জগত থেকে এ মানব সন্তানদেরকে মুক্ত করতে। কিন্তু আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা তেমন সুখকর নয়। সোনালী সাফল্যের দ্বারে আমরা পৌছতে ব্যর্থ হয়েছি বারবার। কিন্তু এবার আমাদের ব্যর্থতার অবকাশ নেই। সফল আমাদেরকে হতেই হবে। কারণ একবিংশ শতাব্দী আমাদের দোড় গোড়ায়। সারা পৃথিবী বিজ্ঞান, কারিগরি ও উন্নয়নের নব নব ধ্যান ধারণায় আগামী শতককে অভিষেক জানাতে অপেক্ষমান। আমাদের পিছিয়ে থাকা চলবে না। তাই আমাদের সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের চাই সবার ঐক্যবদ্ধ, একাত্ম ও দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে প্রচেষ্টা। রাজনৈতিক দলমত, পেশা, ধর্ম বর্ণ সব কিছুর উর্ধ্বে উঠে সকলের এগিয়ে আসতে হবে জাতীয় এ মহান দায়িত্ব পালনে।